পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

আধুনিক যুগ — যুক্তিবাদ
(দেকার্ৎ, স্পিনোজা ও লাইবনিজ)

চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

বৈশ্লেষণিক সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধুনিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য পৃঃ ১—৫

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে উৎপত্তিকাল ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনেতিহাসের তিনটি প্রধান ভাগ ঃ (১) প্রাচীন বা গ্রীক যুগ, (২) মধ্যযুগ এবং (৩) আধুনিক যুগ। প্রাচীনযুগের উৎপত্তিকাল খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দী। এই যুগে তত্ত্বনির্ণয়ের উপায় ঃ স্বাধীন চিন্তা, বিচার ও কল্পনা। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল, এই তিন দার্শনিকের উজ্জ্বল যুগ ঃ ৫ম খ্রীঃ পূঃ ও ৪র্থ শতাব্দী। প্লেটো ও এরিস্টটলের মতের অধ্যয়ন, চর্চা ও অধ্যাপনা খ্রিস্ট্রীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। (পৃঃ ১—২)। তারপর, কিছুকাল ইউরোপের দার্শনিক বিচারের অন্ধকার যুগ। মধ্যযুগের আরম্ভ একাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ে খ্রিস্টান পণ্ডিতীয় দর্শনের উৎপত্তি। তার বিকাশ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পণ্ডিতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। (পৃঃ ২—৩)। আধুনিক যুগের আরম্ভ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে। এর রাজকীয় ও সামাজিক কারণ। ফ্রেন্সিস বেকন ও দেকার্ৎ। বেকনের মতে। (পৃঃ ৪—৫)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেনে দেকার্ৎ পৃঃ ৬—৫৮

দেকার্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচিত গ্রন্থাবলী। (পৃঃ ৬—৭)। তাঁর দর্শনের মূল তত্ত্ব। গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগে দর্শনকে সমগ্র বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তিরূপে দাঁড় করানর প্রয়াস। গাণিতিক পদ্ধতি নিঃসন্দিগ্ধ হয় কেন ? তত্ত্বনির্ণয়ে বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তিবিচার বা প্রজ্ঞার স্থান। প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞান হচ্ছে সাক্ষাৎ আন্তর উপলব্ধি। আধুনিক যুক্তিবাদের ভিত্তি। যুক্তিবাদ বলতে কি বোঝায় ? স্পষ্টতা, বিবিক্ততা ও সম্পূর্ণ বোধগম্যতা হচ্ছে সত্যতার নির্ণায়ক। (পৃঃ ৭—১০)। ধারণা শব্দের দেকার্তীয় অর্থ। এর সম্প্রতিকালীন সমালোচনা। (পৃঃ ১০—১১)। সংশয় পদ্ধতি ঃ দেকার্তীয় সংশয় একটি সাদাসিধে স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা নয়। এই সংশয়ের

বিষয় হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত সম্ভবপরত্ব। সুতরাং এই সংশয় ও যুক্তিবাদীয় পদ্ধতি পরস্পরের সমর্থনকারী ও পরিপূরক। (পৃঃ ১১—১২)। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও স্বপ্ন। স্বপ্নদৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি ও তার নিরসন। গণিতের বিধান সম্পর্কে সংশয় অযৌক্তিক নয় কি? অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী দুষ্ট দানবের সম্ভাবনা। এই সংশয় চিন্তার মূল নিয়মগুলোকে তার আওতায় আনতে পারে না। দেকার্তীয় কৃত্রিম সংশয়ের উদ্দেশ্য। দেকার্ৎ-পরিকল্পিত চতুর প্রতারকও এক জায়গায় প্রতারণা করতে অসমর্থ। "আমি সংশয় করছি, অতএব আমি আছি।" সংশয়কারী নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি। আপত্তির উত্তর। (পৃঃ ১২—১৬)।

কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধতার দ্বারা ধারণার শুধু সম্ভবপরতাই সিদ্ধ হয়, তার সত্যতা সিদ্ধ হয় না। সাক্ষাৎ অনুভব বা তদাশ্রয়ী অনুমানই ধারণার সত্যতার নির্ণায়ক। "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি," এরাও সত্যতা সাক্ষাৎ অনুভবেই নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হয়। 'চিন্তা' শব্দের দেকার্তীয় অর্থ। এই চিন্তা হচ্ছে স্বপ্রকাশ। চিন্তন-ক্রিয়া ও 'আমি'র সম্বন্ধ। "আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি" এই 'অতএব' শব্দের বিশ্লেষণ। দেকার্তীয় সংশয়ের আধুনিক দার্শনিক চিন্তায় স্থান। (পৃঃ ১৬—২০)।

ঈশ্বরের ইস্তিত্ব ঃ ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার অর্থ ও উৎস। নিজেক-সত্তাবাদ। ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ। সত্তাজ্ঞাপক যুক্তি। ঈশ্বরের সততা বা সত্যবাদিতা দিয়ে, ধারণার স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা যে ধারণার সত্যতা-নির্ণায়ক, তার সমর্থন হয়, এই মতটিতে কি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আছে? এই প্রশ্নের দেকার্ৎ-প্রদত্ত উত্তর এর্ডম্যান-এর উত্তর ঃ জ্ঞানের হেতু ও অস্তিতার হেতু। (পৃঃ ২০—২৪)।

দ্রব্য ঃ দ্রব্যের লক্ষণ। দ্রব্য তিনশ্রেণীতে বিভাজ্য ঃ (১) অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর-রূপ চেতন দ্রব্য, (২) মন বা জীবরূপ পরিচ্ছিন্ন চেতন দ্রব্য এবং (৩) জড়বস্তুরূপ পরিচ্ছিন্ন বিস্তারাত্মক দ্রব্য। অত্যন্ত বিলক্ষণ চেতন ও জড়তত্ত্বের দ্বৈতবাদ। এর সমালোচনা।

দার্শনিক বিচারে দেকার্ৎ-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলো কি? (পৃঃ ২৪—২৭)।

জড়জগৎ বা প্রকৃতি ঃ জড়জগতের অস্তিত্বে প্রমাণ। জড়বস্তুর স্বরূপ হচ্ছে বিস্তৃতি। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি ও তার উত্তর। বিস্তৃতি মানে শূন্য দেশ নয়। আসলে শূন্য দেশ বলে কিছু নেই। পরমাণুবাদ ভুল। দেশ = বিস্তৃতি = জড়দ্রব্য। জড়দ্রব্য সংখ্যায় একটিই। তা সর্বদাই গতিশীল। কোনও বিশিষ্ট জড়খণ্ড বা পিণ্ডের গতি, আর সমগ্র জড়বস্তুর গতি এক নয়। এক পিণ্ডের গতি ও বিস্তৃতি অন্যান্য পিণ্ডের গতির অল্পতা ও আধিক্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সমগ্র জড়দ্রব্য বা বিস্তৃতির গতি কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে না। গতির অন্ত্যকারণ হচ্ছে ঈশ্বর। সর্ব গতি ও বিস্তৃতির মোট পরিমাণ জগৎসৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর স্থির করে দিয়েছেন। গতির মূল নিয়মগুলো ঈশ্বরের স্বরূপ থেকেই নির্গত হয়। নিসর্গস্থ ঘটনার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক নিয়মেই দিতে হবে। এসব ঘটনার কোনও উদ্দেশ্য নির্দেশ করা নিরর্থক। পৃথিবী তৎসংলগ্ন অন্যান্য পদার্থের তুলনায় অচল ; সমগ্র ব্যোমমণ্ডল একপ্রকার তরল দ্রব্যে ভরা। আর তা অনবরত ঘূর্ণিঝড়ের মতন আবর্তিত হচ্ছে। (পৃঃ ২৭—৩৩)।

মানুষ ঃ মানুষের শরীর একপ্রকার যন্ত্র। জীবশরীর ও ঘড়ির মতন যন্ত্র একেবারে ভিন্নজাতীয় পদার্থ নয়। প্রথমটির অঙ্গবিন্যাস অধিক জটিল ও ঐক্যসম্পাদক। অবশ্য মানুষের শরীর শুধু স্বয়ঞ্চল যন্ত্র নয়। কারণ স্বয়ঞ্চল যন্ত্রে ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান অসম্ভব ; তাছাড়া, বিচারবুদ্ধিজনিত শারীরিক ক্রিয়াও তাতে থাকতে পারে না। জড়দ্রব্য থেকে আত্মার উৎপত্তি অসম্ভব। ঈশ্বর আত্মাকে জড়ের থেকে ভিন্নজাতীয় দ্রব্যরূপে সৃষ্টি করেছেন। তবু দেহ ও আত্মার বন্ধন শিথিল নয়। আবার দেহ-আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্যও নয়। পিনিয়েল গ্রন্থিতে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ বিশেষভাবে সক্রিয়। (পৃঃ ৩৩—৩৬)। উদ্ভিদ-চেতনা ও জীব-চেতনা দুটিই চেতনা হলেও, প্রথমটিকে চিন্তন

বলা যায় না। চিন্তা বা জ্ঞানক্রিয়া হচ্ছে মানুষের মনের স্বরূপ। ইতরপ্রাণীরা চেতন যন্ত্রমাত্র। তাদের স্বপ্রকাশ অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি নেই। চিন্তন ক্রিয়া দুই-রকমের হয়—স্বাধীন ও পরাধীন। সঙ্কল্প ক্রিয়াটি স্বাধীন। সঙ্কল্পের সাথে জ্ঞানও থাকে। কিন্তু জ্ঞান ক্রিয়া স্বাধীন নয়। (পৃঃ ৩৬—৩৭)। মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অসংবদ্ধ নয়। বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্য আছে। দেকার্ৎ-এর মতে, মানুষের অন্তত এক ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে ; আর তা হচ্ছে বিচার-স্বাধীনতা। (পৃঃ ৩৭—৪১)।

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার সাথে তাঁর সর্বব্যাপারে পূর্ববিধায়িত্ব থাকা সম্ভবপর কি ? স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও ঈশ্বরের কৃপা এদুটি কি পরস্পরের বিরুদ্ধ ? অবধারণের উৎস হচ্ছে স্বাধীন সঙ্কল্পশক্তি। এই স্বাধীনতার জন্যই অবধারণ মাঝে মাঝে ভ্রান্ত হয়। ঈশ্বরের সত্যতা ও কল্যাণময়ত্ব এবং মানুষের এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা, এদুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে নয় কি ? (পৃঃ ৪১—৪৩)।

সত্য নির্ণয়ের ব্যাপারে, যুক্তি বিচার হচ্ছে বিচার-তন্ত্র, সুতরাং পরাধীন। তবু সত্যের নির্ণয়টি গ্রহণ করার কাজটি সঙ্কল্প শক্তির, তাই তা স্বাধীন। মানবীয় পূর্ণতার অর্থ। যথার্থ জ্ঞান আহরণ হচ্ছে মানুষের একটি নৈতিক কর্তব্য। সত্য ও কল্যাণ কি দেকার্তের মতে এক ? অনৈতিক কর্ম ও ভ্রান্ত জ্ঞানের হেতু হচ্ছে সঙ্কল্প শক্তির স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সম্বন্ধে দেকার্তের দুটি মত। এই দুই মতের সামঞ্জস্যের সমস্যা। (পৃঃ ৪৩—৪৫)।

দেকার্তীয় কয়েকটি মতের পুনরালোচনা ও সমালোচনা। চিন্তা ও চিন্ত্যের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য। ২ + ২ = ৪ এই বিষয়ে সংশয় হতে পারে। কিন্তু চিন্তার সম্বন্ধে সংশয় হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব। দেকার্তের সত্তা-নির্ণায়ক যুক্তির কাণ্টপ্রদত্ত সমালোচনা। (পৃঃ ৪৫—৫১)। দেকার্ৎ-প্রদত্ত দ্রব্যের লক্ষণের সম্প্রতিকালীন সমালোচনা। শরীর ও মনের সম্বন্ধ। আধুনিক দর্শনে দেকার্তের স্থান সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা (পৃঃ ৫১—৫৮)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেকার্তীয় দর্শনের ত্রুটি ও তার সংশোধন পৃঃ ৫৯—৬৮

দেকার্তীয় দর্শনের ত্রুটি। উপলব্ধবাদ। গয়র্লি। (পৃঃ ৬১—৬৩)। মালেব্রাঁশ। (পৃঃ ৬৪—৬৮)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্পিনোজা পৃঃ ৬৯—১০০

স্পিনোজার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থাদি। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বিবরণ। কয়েকটি দেকার্তীয় মতের যৌক্তিক প্রকটীকরণে স্পিনোজীয় মতের প্রতিষ্ঠা। আবেগ ভরা ভক্তি দিয়ে জীবের পক্ষে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর। আর এই ভক্তি হচ্ছে বিচারযুক্ত প্রেম। যৌক্তিক বিশ্লেষণ, গাণিতিক অবরোহ-পদ্ধতি এবং দার্শনিক চিন্তা। (পৃঃ ৬৯—৭৩)। দেকার্তীয় যুক্তিবাদের সাথে স্পিনোজীয় যুক্তিবাদের তুলনা। তাদের গাণিতিক পদ্ধতির বৈষম্য। স্পিনোজার দার্শনিক বিচার-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। দর্শনে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগের অর্থাক্ষেপ। (পৃঃ ৭৩—৭৪)। শরীর ও মনের সম্বন্ধবিষয়ক সমস্যায় স্পিনোজীয় সমাধান দেকার্তীয় সমাধানের চেয়ে বেশি সন্তোষজনক। দ্রব্যের একত্ব। (পৃঃ ৭৪—৭৫)।

দ্রব্য, গুণ ও প্রকার : একাধিক দ্রব্য নেই। আর এই দ্রব্যই হচ্ছে ঈশ্বর। স্পিনোজার ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা বনাম খ্রিস্টীয় ধারণা। ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ—ঈশ্বর হচ্ছেন প্রকৃতির মূল প্রকৃতি বা স্বভাব ; তিনি প্রকৃতির প্রকর্তা ও স্রষ্টা নন। স্বাধীনতা মানে অন্তর্নিয়ন্ত্রণ ও তার অনিবার্য কার্যের জনকতা। উদ্দেশ্যমূলক কর্ম ঈশ্বরের পূর্ণতার বিঘাতক। অনন্ত দ্রব্য ও সান্ত পদার্থগুলোর সম্বন্ধ। বিশিষ্ট বা বিশেষণযুক্ত পদার্থ অপূর্ণ হতে বাধ্য। বিশেষণের দ্বারা আসলে অভাবই ব্যক্ত হয়। (পৃঃ ৭৫—৭৯)। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ। গুণের সংখ্যা। গুণগুলি কি দ্রব্যে মানববুদ্ধির দ্বারা আরোপিত ধর্ম ? না, দ্রব্যের স্বরূপেরই অন্তর্গত ? (পৃঃ ৭৯—৮০)। বিশেষ বিশেষ সান্ত পদার্থ-ব্যক্তিগুলো মূল দ্রব্যের অবস্থা বা প্রকার। আর অবস্থা বা প্রকারগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের গুণেরই পরিণাম। বিস্তৃতির দুটি অবস্থা—স্থিতি ও গতি।

চিত্তেরও দুটি অবস্থা—বুদ্ধি বা বিচার এবং সঙ্কল্প। অবস্থাগুলো স্বল্পকাল স্থায়ী। কাদাচিৎকত্বের অর্থ হচ্ছে আছেও বটে, নাইও বটে। আদি কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর। অবস্থাগুলো হচ্ছে দ্বৈতীয়িক কারণ। অবস্থা বা প্রকারের রাজ্যে কার্য-কারণীয় শৃঙ্খলে সবকিছু বাঁধা। মানসিক অবস্থাসমূহের পরম্পরা মানেই সীমাবদ্ধ। তেমনি বিস্তৃতির অবস্থা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গতির পরম্পরা বিস্তৃতিতেই সীমাবদ্ধ। এরা মানসিক অবস্থার ওপর কোনও পরিণাম ঘটাতে পারে না। তেমনি মানসিক অবস্থাগুলো বিস্তৃতির অবস্থার ওপর কোনও পরিণাম ঘটাতে পারে না। তবু, শারীরিক পরিণাম-পরম্পরা ও মানসিক পরিণাম-পরম্পরা, এদুটি মূলত একই পরম্পরা—মনের বা চিত্তের দিক ও বিস্তৃতির দিক থেকে আলাদা আলাদা ভাবে দৃষ্ট হলেই এরা একেবারে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। (পৃঃ ৮০—৮২)। জড়জগৎ ও মনোজগতের এই ভিন্নতা সত্ত্বেও এদের অনুরূপতা আছে। স্পিনোজার এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি। অনন্ত বা অসীম অবস্থা = সর্বব্যষ্টির সুশৃঙ্খল সাফল্য। (পৃঃ ৮২—৮৪)।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের বিষয় হচ্ছে শরীরের পরিণাম বিশেষ। এটা জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে বাহ্যবস্তুর এবং নিজের শরীর সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা অবিবিক্ত ও খণ্ডিত। তথাপি এই জ্ঞান মিথ্যা নয়। অবশ্য ইন্দ্রিয়জ ধারণাকে পূর্ণাঙ্গ বলে ভাবলে, ধারণাটি মিথ্যা হয়ে পড়ে। মিথ্যা ধারণার উদাহরণ হচ্ছে জাতি বা সামান্যের বিধারণা, উদ্দেশ্যের কল্পনা, ঐচ্ছিক স্বাধীনতার কল্পনা প্রভৃতি। সুন্দর ও কুৎসিত প্রভৃতির ধারণা কল্পনার পর্যায়ে পড়ে। সঙ্কল্প নামক কোনও পদার্থ নেই। তথাকথিত সঙ্কল্পও কল্পনার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা নিশ্চয়ই সত্য পদার্থ। কিন্তু ইচ্ছার কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকলে, এবং ইচ্ছা জনিত কাজ সম্বন্ধে সচেতন হলে, আমরা ঐ ইচ্ছাকে স্বাধীন বলে কল্পনা করি। (পৃঃ ৮৪—৮৭)।

বিচারজনিত জ্ঞানের পূর্ণতা ও সত্যতা থাকলেও, এই পূর্ণতার ও সত্যতার তারতম্য আছে। বিচারজনিত জ্ঞানের নিখুঁত উদাহরণ হচ্ছে দ্রব্য ও তার গুণগুলোর স্পিনোজীয় ধারণা। জ্ঞানের তিন

প্রকার ঃ (১) ঐন্দ্রিয়িক অর্থাৎ কল্পনামিশ্রিত ধারণা, (২) বিচারবুদ্ধিজনিত জ্ঞান (৩) প্রত্যক্ষানুভূতি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার জ্ঞান অবশ্যম্ভব ও নিঃসন্দিগ্ধ। পর্যাপ্ত জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে শাশ্বততত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর, এবং তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সর্ববস্তুকে বিচারবুদ্ধি সাক্ষাৎভাবে জানে (পৃঃ ৮৭—৮৮)।

ঘৃণা, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি হৃদয়াবেগগুলো মনুষ্যস্বভাবের অবশ্যম্ভব অঙ্গ। মানুষের সসীমতাবশত ও তজ্জন্য অন্যান্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীলতাবশত এসব হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হয়। স্বাস্তিত্ব বজায় রাখার মৌলিক প্রচেষ্টা প্রত্যেক পদার্থের স্বভাবের একটি অঙ্গ। এটা যখন মনের ধর্মরূপে বিবেচিত হয়, তখন তাকে সঙ্কল্প বা এষণা বলে। আর এই প্রচেষ্টা যখন শরীর ও মনের মিলিত ধর্ম বলে ভাবা হয়, তখন তার নাম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লালসা ইত্যাদি। সঙ্কল্প মানে জ্ঞান-যুক্ত স্পৃহা।

ভাল মানে আমরা যা চাই। ভাল বলে যে আমরা কিছু চাই, তা নয়। সুখ মানে যা আত্মার চিন্তাশক্তি বাড়ায় ; আর দুঃখ মানে যা মানুষের ক্রিয়াশক্তি কমিয়ে দেয়। হার্দিক-চেতনার তিনটি প্রধান শ্রেণী আছে ঃ (১) এষণা, (২) সুখ এবং (৩) দুঃখ। প্রেম, বিদ্বেষ প্রভৃতি হৃদয়াবেগগুলো এই তিনটির বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। যথা, সুখের সাথে তার বাহ্য কারণের ধারণা সংযুক্ত হলে, তাকে প্রেম বা ভালবাসা বলে। হৃদয়াবেগের দুটি প্রকার আছে ঃ পরাধীন ও স্বাধীন। সংযম, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতিকে হৃদয়াবেগ বলা যায় না। বরং এগুলো হচ্ছে স্বাধীন মনোবল। মনোবলের দুই প্রকার ঃ (১) আত্মিক বীর্য ও (২) ঔদার্য। (পৃঃ ৮৮—৯১)।

বিধান ও ধারণা পরস্পরের সাথে অবিনাভাবে যুক্ত। জ্ঞানের যেমন কল্পনা ও বুদ্ধি বলে দুটি স্তর, তেমনি সঙ্কল্পেরও দুটি স্তর ঃ সাধারণ ইচ্ছা ও নিজ নির্বাচিত ইচ্ছা। প্রথমটি কল্পনার দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিচারবুদ্ধি জনিত ইচ্ছা বা হৃদয়াবেগের বিষয় হচ্ছে শাশ্বত পদার্থ, অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অথবা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আন্তরোপলব্ধি। পরাধীন ভাবাবেগ অবিবিক্ত ও বিমিশ্র ধারণা থেকে উৎপন্ন হয়। ধারণা

স্পষ্ট ও বিবিক্ত হলে, পরাধীন ভাবাবেগের ওপর প্রভুত্ব লাভ সম্ভবপর। ধারণা স্পষ্ট করার উপায় হচ্ছে, ধারণার বিষয়টিকে, তা কার্যকরণীয় সম্বন্ধে যে সমগ্রের অন্তর্গত, তার সাথে সম্বন্ধভাবে অর্থাৎ ঐ সমগ্রের একটি অপরিহার্য অংশ রূপে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধিতে একপ্রকার নির্মল আনন্দ আছে। আর এই নির্মল আনন্দ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রেমের সাথে জড়িত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা ও তাঁকে ভালবাসা হচ্ছে আসলে প্রজ্ঞাপ্রসূত প্রেম। (পৃঃ ৯১—৯৪)। মানবাত্মার শাশ্বত অংশটির নাম প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি। এরই শক্তিতে মানুষ স্বয়ং-ক্রিয় হয়। খারাপ, অহিত এবং অমঙ্গল মান বিচারবুদ্ধির বিকাশে ও যুক্তি-সঙ্গত জীবনযাপনে বাধা দেয়।

সক্রেটিসের মতন স্পিনোজার দর্শন বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার ওপর অর্থাৎ প্রজ্ঞার অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বেঁচে থাকার যে সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের ভেতর বিদ্যমান, তার স্বাভাবিক গতি হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের দিকে; আর জ্ঞান হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বা অংশ। সব মানুষ নীতিমান হয় না কেন? সব মানুষ জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনে চেষ্টা করে না কেন? অপূর্ণতার ব্যাখ্যা কি? অপূর্ণতা কোনও ভাব-পদার্থ নয়। পূর্ণতার নানা মাত্রা দেখে, অপূর্ণতার কল্পনা করা হয়। (পৃঃ ৯৪—৯৬)। মূল্য-বোধক ধারণাগুলো বস্তুশূন্য কল্পনামাত্র। এর অবশ্য সত্য প্রতিষ্ঠান আছে। আর তা হচ্ছে আমাদের চিত্তে যা যা সুখ বা দুঃখ জন্মায়। তাকেই ভাল বা মন্দ বলা হয়। কিন্তু স্ব-স্বরূপে বিবেচিত হলে প্রত্যেক পদার্থই পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। মূর্খ ও পাপী সবাই আসলে পূর্ণতারই অধিকারী—শুধু জ্ঞানী ও পুণ্যাত্মার পাশে তাকে মূর্খ ও পাপী বলে মনে হয়। বাহ্য কারণের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাই মানুষের পাপাচরণের হেতু। একমাত্র উন্নত-চরিত্রের লোকেরাই এক বাহ্য প্রভাব সত্ত্বেও স্বীয় স্ব-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। ঈশ্বর যা কিছু দ্রষ্টব্য বলে মনে করেন, তাই অস্তিত্ববান বস্তুরূপে পরিণত হয়। সব মানুষ বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয় না, ভগবান এরকম করলেন কেন? এর কারণ এই যে, পূর্ণতার

যতগুলো মাত্রা বা স্তর সম্ভবপর, ঈশ্বর সে সবই সৃষ্টি করেছেন। আর, এগুলোর ভিতর নিম্নতম স্তরে পাপ ও ভ্রান্তি রয়েছে। পূর্ণতার নিম্নতর মাত্রা বাদ দিলে, সমগ্র পূর্ণতাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাপ, পুণ্য প্রভৃতি গুণভেদগুলোকে স্পিনোজা বিভিন্ন মাত্রার ভেদ বলে বুঝতে চেয়েছেন। এই স্পিনোজীয় বিচার প্রণালীটিকে পরে লাইবনিজ একটি প্রশস্ত রাজমার্গে পরিণত করেছিলেন। (পৃঃ ৯৬—৯৮)।

রাজনীতিতে স্পিনোজা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার বিরোধী গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁর একটি পরবর্তী গ্রন্থে তিনি অভিজাততন্ত্রের দিকে বেশি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের একটি বিশেষ কর্তব্য। কিন্তু তদুপরি রাষ্ট্রের আরও উন্নততর উদ্দেশ্য আছে। তা হচ্ছে বিচারবুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করা। প্রকৃত নীতিমত্তা ও প্রকৃত স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রজীবনেই সম্ভবপর (পৃঃ ৯৮—৯৯)।

দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে স্পিনোজার যে সকল মতের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে তাঁর যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদ, জড় ও চেতনের মূলগত অভেদ, এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক নিয়মের অবাধ আধিপত্য। স্পিনোজা ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ও বিশ্বানুস্যূত স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে কোনও যোগসূত্র দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর মতে, ঈশ্বর অনন্ত অথচ মানববুদ্ধি তাঁকে সাক্ষাৎ অনুভব জানতে পারে, স্পিনোজার এই মতটিও বুঝতে পারা কঠিন। (পৃঃ ৯৯-১০০)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাইব্‌নিজ্‌ পৃঃ ১০১—১২৬

স্পিনোজার যৌক্তিক সর্বেশ্বরবাদ এবং লকের ইন্দ্রিয়ানুভবীয় ব্যক্তিবাদ, এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গম বা মিলনস্থাপন, এটাই লাইবনিজের দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'পর্যাপ্ত-হেতু' নামে একটি নতুন বৌদ্ধিক তত্ত্বের নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, যুক্তিবিচার ও ইন্দ্রিয়সংবেদনে পার্থক্য সত্ত্বেও, দ্বিতীয়টি প্রথমের অপরিহার্য সোপান। (পৃঃ ১০১)।

লাইবনিজের সংক্ষিপ্ত জীবন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিবিধ বিষয়গামী সূক্ষ্ম ও মৌলিক বুদ্ধিশক্তি। তাঁর লিখিত গ্রন্থতালিকা। (পৃঃ ১০১—১০৩)। চিদণুর স্বরূপ হচ্ছে প্রাচীন জড়-পরমাণু ও 'আধুনিক দেকার্তীয় ধারণা'র সম্মিলন। তবু চিদণুর কল্পনার অভিনবত্ব স্বীকার করতে হবে। স্বাধীনতার নতুন লক্ষণ ও এই লক্ষণের আবশ্যকতাঃ দ্রব্যের দেকার্তীয় লক্ষণের পরিবর্তন। চিদণুর স্বরূপ ও অস্তিত্বের প্রমাণ। চিদণুদের উচ্চ-নীচ স্তর তাদের সক্রিয়তা ও তাদের ধারণার স্পষ্টতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। অবিভাজ্য পরমাণু পেতে হলে, জড়জগৎ ছেড়ে চেতন জগতে আসা দরকার। গাণিতিক বিন্দু অবিভাজ্য হলেও, তা মনের কল্পনা মাত্র—বস্তুজগতে তার অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানে ও ক্রিয়াতে চিদণু স্বয়ং সম্পূর্ণ। তার অস্তিত্ব শুধু ঈশ্বর দিতে অথবা নিয়ে যেতে পারেন; নইলে, তা অমর। লাইবনিজ দেকার্তীয় দর্শনকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রবেশদ্বার ও পরমাণুবাদকে চিদণুবাদের পূর্বাভাস বলে প্রশংসা করেছেন। প্রথম মতের থেকে অর্থাপন্ন হয় যে, দ্রব্য মানে যা স্বয়ং-ক্রিয়, দ্বিতীয়টি থেকে অর্থাপন্ন হয় যে, প্রকৃত দ্রব্য হচ্ছে চেতন, স্ব-লক্ষণ এবং একক। চিদণুর এই দ্বৈত রূপ থেকে বোঝা যায় যে, চিদণু হচ্ছে মূলত ধারণা-উৎপাদক একপ্রকার শক্তি বা বল। বিশ্বে অসংখ্য চিদণু ও তাদের অসংখ্য ধারণা, এই দুরকম পদার্থই একমাত্র সত্য বস্তু।

সব চিদণুর ধারণা-উৎপাদক শক্তি একরকম নয়। অধিকাংশ চিদণুর শুধু সংবিৎ থাকে কিন্তু স্ব-সংবিৎ থাকে না। কেবল সংবিৎ ও স্ব-সংবিৎ এই দুয়ের পার্থক্য হচ্ছে ধারণার ক্ষীণতা এবং সরলতার অথবা অস্পষ্টতা ও স্পষ্টতার মাত্রা কিংবা স্তরের ভেদ। নিম্নস্তরের চিদণুগুলো প্রায় অচেতন বা সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকটি চিদণু অন্য প্রত্যেকটি চিদণুকে প্রতিবিম্বিত করে, অর্থাৎ স্বীয় ধারণা দিয়ে জানে। তাই প্রত্যেক চিদণু হচ্ছে একেকটি ক্ষুদ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র বিশ্বের একেকটি সজীব দর্পণ। ঈশ্বরই সম্পূর্ণভাবে সমগ্র বিশ্বকে স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত করেন। অন্যেরা অল্পাধিক মাত্রায়। মানব-চিদণুর

কতক ধারণা স্পষ্ট; কিন্তু অন্য অসংখ্য ধারণা অস্পষ্ট। অস্পষ্টতা অথবা নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত সক্রিয়তা। পণ্ডিতীয় দর্শনের ভাষায়' সক্রিয়তা হচ্ছে ফর্ম্ বা আকার, আর নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে জাড্য বা তমোগুণ। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য চিদণুগুলো আকার (অথবা অন্টেলেচি অথবা আত্মা) এবং জড়ের মিশ্রণ। এই জাড্য বা তমোগুণ হচ্ছে চিদণুর স্বাভাবিক সক্রিয়তার প্রতিরোধকারী পদার্থবিশেষ। পিণ্ড বা ভরাট মূর্তিও আসলে জড়তা বা তমোগুণেরই প্রকার; কিন্তু তা দ্বিতীয় স্তরের জড়তা। প্রথম স্তরের জড়তা হচ্ছে ধারণার অবিবিক্ততার হেতু; আর দ্বিতীয় স্তরের জড়তা হচ্ছে প্রথম স্তরের জড়তার কার্য। যা অবিবিক্তভাবে জ্ঞাত, তাই পিণ্ডাকারে অথবা ভরাট মূর্তিরূপে অবভাসিত হয়। (পৃঃ ১০৩—১০৮)।

জীবমাত্রকেই আত্মা বলা চলে না। স্ব-সংবেদনযুক্ত জীব যখন বিচার-বুদ্ধি অথবা সার্বিক সত্য জানার সামর্থ্য লাভ করে, তখনই তাকে আত্মা বলা সঙ্গত। অধিকাংশ চিদণু অস্পষ্ট ও নির্জ্ঞান ধারণার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। যে চিদণু প্রত্যক্ষজ্ঞানযুক্ত হার্দিক অনুভবের মালিক, তাকে জীব বলা যায়। জীব হচ্ছে চিদণুর দ্বিতীয় স্তর। আর আত্মা চিদণুর তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তর। প্রত্যেক স্তরেই, নিম্নতর স্তরের চিদণুগুলোও সমাবিষ্ট থাকে।

বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ থেকে কামনা বা এষণার জন্ম। সুতরাং এষণা পদার্থটি মূলত প্রত্যক্ষক্রিয়ার থেকে ভিন্ন নয়। প্রত্যেক ধারণার ভেতর, অন্য ধারণার রূপান্তরিত হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকে। এরই নাম কামনা বা এষণা। পরিবর্তন-উন্মুখ ধারণারই অপর নাম হচ্ছে প্রেরণা। প্রত্যক্ষ যখন জ্ঞানযুক্ত এবং যুক্তিবিচারানুগ হয়, তখন এষণা সঙ্কল্পে পরিণত হয়। (পৃঃ ১০৮)।

প্রত্যেক চিদণুর ভেতর, বিশ্বের অন্য সববস্তু ধারণাগুলো বীজরূপে নিহিত থাকে, এবং যোগ্য সময়ে সেখান থেকেই তাদের অভিব্যক্তি হয়। তাই, যে কোনও বস্তু সম্বন্ধেই চিদণুর যে ধারণা হয়, তা ঐ চিদণু নিজের ভেতর থেকেই আহরণ করে। তবু, প্রত্যেক চিদণুর মধ্যস্থ ধারণাগুলো অন্যান্য চিদণুর মধ্যস্থ ধারণাগুলোর

সদৃশ। এই সাদৃশ্যের হেতু হচ্ছে ঈশ্বরের পূর্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। এই পূর্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার জন্যই বিভিন্ন বস্তু পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করতে পারে বলে আমাদের মনে হয়। আসলে, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাই এই প্রতিভাসের হেতু। দেহ ও আত্মার ভেতরেও, ঐ একইরকম সম্বন্ধ। দেহ ও আত্মা যেন এমন দুটি ঘড়ি, যাদের একটিতে যে সময় দেখায়, অপরটিতেও তাই। উপলক্ষবাদের তুলনায়, এই পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যের ধারণাটিতে অনেক লাঘব ও সুবিধে আছে। (পৃঃ ১০৮—১০৯)।

একই চিদণু বহু বস্তুর প্রতিবিম্ব ধারণ করে। তাইতো, বলা যায় যে এখানে একের ভেতর বহু রয়েছে ; আর বিভিন্ন চিদণুর ধারণাগুলো যে পরস্পরের সদৃশ, এতে আমরা পাই বহুর ভেতর এক। সাদৃশ্য সত্ত্বেও, চিদণুগুলোর ধারণাগত বিবিক্ততার বিভিন্ন তারতম্য নিয়ে, সর্ব চিদণু মিলে, একটি পূর্ণাঙ্গ সুর-সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে। এই বৈচিত্র্যের সাথে যে শৃঙ্খলা, এতেই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার আদর্শটি বাস্তবায়িত হয়। চরম বৈচিত্র্যের সাথে চরম ঐক্য মিলিত হওয়াতে, বিশ্বে কোনও কিছুর অভাব নেই : এবং এমন কিছুও নেই, যা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ যতরকম যতগুলো জগৎ হওয়া সম্ভবপর, তাদের ভেতর, আমাদের জগৎ-ই-সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম। নিম্নস্তরের চিদণুগুলো সমগ্র বিশ্বের পূর্ণতার সম্পাদক। সৃষ্টির আদিতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের জোরে, চিদণুদের উৎপত্তি হয়। এর আগে, এসব চিদণু বীজরূপে, অর্থাৎ ধারণার আকারে, ঈশ্বরের মনে বিদ্যমান ছিল। অস্তিত্ব লাভ করাতে, চিদণুদের স্বরূপ বাড়েও না, কমেও না। সম্ভাবনার ভেতর অস্তিত্ব লাভের দিকে একটি প্রবণতা থাকে। এই সম্ভাবনার স্বরূপটি যত বেশি মাত্রায় পূর্ণ হয়, উক্ত প্রবণতার জোর ও যৌক্তিকতা তত বেশি। যেসব সম্ভাবনার ভেতর, এই প্রবণতা সর্বাধিক, সেগুলোই অস্তিত্বের রাজ্যে প্রবেশ করার হুকুম পায় ; চিদণু স্বীয় পূর্ণতার দ্বারা অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করে, এরকম নয় ; কিন্তু তা যে সমূহের একটি অংশ, ঐ সমূহের দ্বারা তা পূর্ণতা অর্জন করে। সম্ভাব্য জগৎগুলির ভেতর, যে জগৎটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঈশ্বরের বিবেচনায় নির্ধারিত হয়, সেই

সম্ভাব্য জগৎই তাঁর শক্তিতে বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ সর্বাধিক কল্যাণের বিচারদ্বারাই ঈশ্বরের এই নির্বাচন নির্ধারিত। সর্বাধিক কল্যাণের অমোঘ নিয়মটি একটি ব্যাপকতর নিয়মের প্রকারবিশেষ। এর নাম হচ্ছে—'পর্যাপ্ত হেতুর তত্ত্ব'। তর্কবিদ্যায় স্বীকৃত 'চিন্তার নিয়মগুলো' যতখানি প্রামাণ্যের অধিকারী, এই তত্ত্বটিও ততখানি। পর্যাপ্ত হেতুর দ্বারা কাদাচিৎক সত্তার, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক সত্তার, জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ধারিত হয়। আর অবশ্যসম্ভব চিরন্তন সত্তার যৌক্তিক জ্ঞান অবিরোধ তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। (পৃঃ ১০৯—১১১)।

কোনও ভেদই জাতিগত বা গুণগত নয়, কিন্তু ন্যূনাধিক মাত্রাগত। স্থিতি ও গতি পরস্পরের বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু স্থিতি হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মন্থর গতি। যে বৈসাদৃশ্য ক্রমে হ্রাস পেতে পেতে, অদৃশ্য হয়ে যায়, তারই নাম সাদৃশ্য। অমঙ্গল মানে স্বল্পীকৃত মঙ্গল। তবু, জগতের কোথাও এমন দুটি পদার্থ বা ঘটনা নেই, যারা সর্বতোভাবে সমান। যদি তারা সর্বতোভাবে সমান হত, তাহলে তারা দুই থাকত না, এক হয়ে যেত। পার্থক্য মাত্রই স্বরূপের অন্তর্গত।

জীব ছাড়া, অন্য কিছুকেই সত্তাবান বলা চলে না। অজৈবের প্রতিভাস তো হয়। এর ব্যাখ্যা কি? বিস্তারযুক্ত জড় পিণ্ডের অবভাসটি অবিবিক্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে উৎপন্ন হয়। পিণ্ড হচ্ছে শুধু কতকগুলো চিদণুরসমূহ। এই সমূহটি অবিবিক্তভাবে প্রতিভাত হলে, তা নিরেট বস্তু বলে প্রতিভাত হয়। তথাপি জড়পিণ্ডের ধারণার বিষয়রূপে একটি জ্ঞাতৃবহির্ভূত চিদণু-সমুদায় রয়েছে। সুতরাং জড়পিণ্ডের অবভাসকে তুচ্ছ আকাশকুসুমের মতন অসৎ পদার্থ বলা ঠিক হবে না। দেশ এবং কালও পরমার্থতঃ সৎ নয়। দেশ ও কাল দ্রব্যও নয়, দ্রব্যের ধর্মও নয়। এগুলো শুধু প্রাতিভাসিক পদার্থ মাত্র। প্রথমটি সমকালীন বিদ্যমানতার ক্রমবিশেষ, আর দ্বিতীয়টি পূর্বাপর অস্তিতা অথবা অনুবৃত্তির ক্রম। (পৃঃ ১১২—১১৫)।

নিরাত্ম দেহ নেই। অশরীরী আত্মাও অসম্ভব। আত্মামাত্রই কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর চিদণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। এই নিম্নশ্রেণীর চিদণুগুলোই ঐ আত্মার শরীর। আত্মার অথবা চিদণুর মৃত্যু নেই। মানুষ এবং ইতর প্রাণীর জন্ম পূর্ব ও মৃত্যুত্তর অস্তিত্ব আছে। তবু, শুধু মানুষের আত্মার এই অনন্ত অস্তিত্বটিকে অমৃতত্ব নাম দেওয়া যায়। মানুষের মনের ধারণাশূন্য অবস্থা হতে পারে না। সু-যুক্তিতেও চিন্তা বা ধারণার অত্যন্তভাব নেই ; থাকলে, সুষুপ্তির কোনও ধারণাই আমাদের হতে পারত না। প্রত্যেকটি প্রকট ধারণা তৎপূর্ববর্তী অন্য কোনও ধারণা থেকে উৎপন্ন হয়। ধারণা ইন্দ্রিয় সংবেদন-জাত, না অন্তর্নিহিত, এই প্রশ্নের উত্তরে, লক্ ও দেকার্তের মতের বিরোধ এড়ানো সম্ভবপর। চিদণুর কোনও জানালা নেই। (পৃঃ ১১৫—১১৮)। কৃতির অনিবার্যতা সত্ত্বেও, কর্ম-স্বাধীনতার হানি হয় না। স্বাধীনতার দুইরকম ব্যাখ্যা। নীতিমান ব্যক্তির কাছে স্ব-পর ভেদ নেই। ন্যায়-পরায়ণতার তিনটি স্তর আছে। (পৃঃ ১১৯—১২১)।

ধর্মীয় তত্ত্বের পূর্ণ আকলন মানববুদ্ধির পক্ষে সম্ভবপর না হলেও ধর্মীয় তত্ত্ব যে যুক্তিবিরুদ্ধ নয়, তা বুঝতে পারা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞাপক সত্তাবিষয়ক যুক্তি এবং সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক যুক্তি দুটির সামান্য পরিবর্তন আবশ্যক। (পৃঃ ১২২—১২৪)। আশাবাদের সমর্থন। তিন প্রকার অকল্যাণ ; এবং পূর্ণ কল্যাণের জন্য এসব অকল্যাণের আবশ্যকতা। নৈতিক অমঙ্গলের লাইবনিজীয় সমর্থনটি খুবই দুর্বল ; তার তুলনায় হেগেলীয় সমর্থন অনেক কম অসন্তোষজনক। (পৃঃ ১২৪—১২৬)।

শব্দকোষ পৃঃ ১২৭—১৩০
নির্ঘন্ট পৃঃ ১৩১—১৩৩